Prantik Gabeshana Patrika ISSN 2583-6706 (Online)
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-4 Issue-1 July 2025

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তালিমীশিক্ষা ও তার প্রবাহ

দেবাশীষ দাস

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2025/07/24_Debasish-Das.pdf

সারসংক্ষেপ: বৈদিক যুগে সামবেদে সঙ্গীত প্রকাশের সূত্র মেলে। বেদের শ্লোকগুলিও সুর-তাল-লয় দ্বারা নিবদ্ধ ছিল। বর্তমানের মার্গ সঙ্গীত বৈদিক যুগের সঙ্গীতেরই বিবর্তিত রূপ। সঙ্গীতের আরেক পরিচয় ললিতকলা। বহুমুখী ব্রহ্মবিদ্যার অন্যতম হলো সংগীতবিদ্যা। সাতসঙ্গত বিনা সঙ্গীত অপূর্ণ, রস মাধুর্যহীন। ভারতবর্ষের সঙ্গীত পদ্ধতির দুটি ধারা — উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতি ও দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতি। বর্তমান প্রবন্ধে এই সঙ্গীতেরই তালিমীশিক্ষা আলোচিত হয়েছে।

সূচক শব্দ: সঙ্গীত, বেদ, ব্রহ্ম, পদ্ধতি, রাগ, তাল, লয়, গীত, ছন্দ।

"**ন** নাদেন বিনা গীতং ন নাদেন বিনা স্বর।
ন নাদেন বিনা জ্ঞানং ন নাদেন বিনা শিব।।"(সঙ্গীত রত্নাকর)

আর্য ভূমি ভারতবর্ষের সংস্কৃতি আলোচনা যেন অনন্ত বারিধি থেকে হারিয়ে যাওয়া মুক্তার অন্বেষণ। ভারতীয় দর্শনের শুধু কাল নিরূপণেই কত দ্বন্দ্ব ও মতভেদ। সেই বৈদিক যুগ তা আট হাজার বছর হোক বা পাঁচ হাজার বছর পূর্বের হোক তাতে বিরাম দিয়ে যদি, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি বা উপলব্ধিতে যাই তবে একটু উদারপন্থী হলে, পূর্ব শাস্ত্রাদির মতবাদে যতই বিবাদ থাকনা কেন, নিরপেক্ষ ভাবে দেখলে তাদের মধ্যে একটি মেলবন্ধন বা যোগসূত্র লক্ষিত হয়। তা হলো, বৈদিক যুগ থেকে ত্রয়ী বেদ শাখা উল্লেখিত সামবেদে সঙ্গীত প্রকাশের সূত্র পাওয়া যায়। বেদের সূত্র অর্থাৎ তার শ্লোকগুলি সুর-ছন্দ-তাল-লয় দ্বারা নিবদ্ধ ছিল। আর তা মুনি ঋষিদের যজ্ঞ অনুষ্ঠানে, বিবিধ কর্মকাণ্ডে সমবেত ভাবে বা একক ভাবে গীত হতো।

বর্তমানে যে রাগসঙ্গীত যাকে মার্গসঙ্গীত বলা হয়, তা পূর্বের বৈদিক যুগের ক্রম বিবর্তন। আমরা ভারতীয়রা ভাব দর্শনের যতই গভীরে যাব, ততই বিস্ময়াভিভূত হতে হবে। যাকে সঙ্গীতের কাল বা উৎপত্তিক্রম যাই বলি না কেন তা অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত হওয়া নাদলহরী মাত্র। অর্থাৎ ভারতীয় দার্শনিকগণের ভাবনা-চিন্তায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে অনন্তকাল, এই সঙ্গীত আকাশে বাতাসে অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বে (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম) অর্থাৎ গ্রহ নক্ষত্রে এককথায় প্রতিটি অণু পরমাণু নির্দিষ্ট সুর, ছন্দ ও তালের দ্বারা শৃঙ্খলিত। কেউ স্বাধীন নয়, ছন্দহীন নয়, পরম ব্রহ্মের শাসনে আমরা সকলে (আব্রহ্মাভুবন লোকা) শাসিত অর্থাৎ দাসত্ব করছি। বৈজ্ঞানিক ভাবে শ্রুতিনন্দন সেই সুর-লয়-তালে স্থুল বহিঃপ্রকাশ মানব সমাজে সঙ্গীত নামে অভিহিত।

অবশ্য এই সকল ভাবনাচিন্তা আজ সমাজ থেকে অনেক দূরে। যে শিক্ষায় বর্তমান সমাজ শিক্ষিত তা আজ সমগ্র সমাজ দেশে পরিপন্থী না সহায়ক? একথা আজ আমাদের প্রশ্নের মুখে রেখেছে। সঙ্গীতের আর এক উপাধি বা পরিচয় ললিতকলা যার ক্রিয়াত্মক অংশেরই প্রাধান্য। কিন্তু তার বিচারে শাস্ত্রের দিক একেবারে বর্জিত পরন্তু শাস্ত্র দ্বারা কঠিনতম শাসনে শৃঙ্খলিত। সভ্যতার উন্মেষের গতিপথে যতকাল অতিবাহিত হয়েছে তা সামাজিক, আর্থিক, রাষ্ট্রীয় জাত, বর্ণ, ভৌগলিক অবস্থান এগুলির সঙ্গে শিক্ষা, শিল্প, দর্শন, অধ্যাত্মবাদ এককথায় মানব জীবনের প্রতিটি অংশে ও চিন্তা ভাবনায় ওতপ্রোত জড়িত বা ক্রিয়াশীল।

বৈদিক যুগের সকল শিক্ষা ব্যবস্থাই আশ্রম কেন্দ্রিক। তা সাহিত্য, সংস্কৃতি, ভেষজ, অধ্যাত্ম, সঙ্গীত যাই হোক না কেন গুরুগৃহে থেকে শিক্ষা লাভ করতে হতো। আমরা উপনিষদগুলি থেকে আশ্রমিক জীবনচর্চার একটি চিত্র খুব স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাই। হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো সভ্যতায় এর প্রকাশ দেখা যায়। আমাদের শেষ চরমতম উৎকর্ষতা প্রাপ্ত বৃহত্তম প্রাচীন শিক্ষায়তন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে দশ হাজার শিক্ষার্থীর থাকার ও পূর্ণ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। তুর্কি নেতা বখতিয়ার খিলজি নব্বই লক্ষ পুঁথি-সহ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে ভস্মসাৎ করে ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করেছিল এটিই বোধ হয় শেষ বৃহৎ আশ্রমিক শিক্ষা ব্যবস্থার পতনের ইতিহাস।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ সেই শিক্ষার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়ে শান্তিনিকেতন স্থাপন করেন। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃতির সঙ্গে গুরু সান্নিধ্যে মুক্ত অঙ্গানে শিষ্যরা তাঁর নিজ চিত্তসত্তাকে জানুক, চিনুক। তিনি চেয়েছিলেন আশ্রমিক শিক্ষার্থীরা কর্মী, জ্ঞানী, পণ্ডিত হওয়ার চেয়ে পূর্ণ মানুষ হওয়া অতি প্রয়োজন। আজ সমগ্র বিশ্বে জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিতের অভাব নাই। কিন্তু পরিপূর্ণ মানবতার অনেক অভাব। একবিংশ শতাব্দীতে অনেক জ্ঞানী, গুণী, বিজ্ঞানীর প্রাচুর্যতা আছে কিন্তু সে মানবতার ভিক্ষুক। সেই দারিদ্রতাকে দূর করার দায়িত্ব আজ ভারতীয়দের। ভারতবর্ষই আগামী দিনের পৃথিবীকে উপনিষদীয় শিক্ষার বাণী শোনাবে (বসুধৈব কুটুম্বকম)। গুরুদেবের ভাষায় "ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।"

সভ্যতা সংস্কৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন অর্থাৎ জ্ঞানলাভের জন্য বিদ্যালয় আধারিত শিক্ষা ব্যবস্থাই এখন চূড়ান্ত। সেখানে গুরুর সান্নিধ্যে গুরুগৃহে শিক্ষালাভ একমাত্র সঙ্গীত শিল্পের মধ্যেই বর্তমান। বিদ্যালয় লব্ধ শিক্ষার চেয়ে গুরুকুলে শিক্ষার মান্যতা অনেক বেশি। গুরু সান্নিধ্যে তালিম ও রিয়াজ সর্বোপরি নিষ্ঠা ও অধ্যাবসায় শুচিতা, ব্রহ্মচারিতা, চরিত্র গঠন এগুলি সাধনার বিশেষ সহায়ক। তবে একথা অনস্বীকার্য আজ থেকে শতবর্ষ আগে যে গুরুশিষ্য পরাম্পরা গত সম্বন্ধ ছিল আজ তা স্বপ্ন সদৃশ। কারণ গুরুর আত্মিক ব্যবহার পুরস্কারে ও তিরস্কারে পূর্ণ ছিল, ছিল পিতা পুত্রের সম্বন্ধ, ছিল শিষ্যগণের গুরু ভক্তি। "প্রণীপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" (গীতা), এই সূত্র শিষ্যকুলের চরমতম সম্পদ ছিল। আজ আমরা যাঁদের শ্রুতির গগনে এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসাবে দেখি তাঁদের শিক্ষার পটভূমিকা গুরুগৃহে বাস অতিব তাৎপর্যপূর্ণ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। এক একটি জীবন স্বতন্ত্র ইতিহাস। আজ ক'জন আমরা তাঁদের খোঁজ রাখি! জনান্তিকে জানাই, গুরু সান্নিধ্যে থেকে তালিম পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করা সত্ত্বেও দীর্ঘ আট বছর কাল গুরুগৃহে পণ্ডিত মানস দাসগুপ্ত মহাশয়ের কাছে তালিম পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। এই স্মৃতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থাৎ গুরুগৃহে তালিমের আস্বাদন স্বতন্ত্র।

"গীদত বাদচ নৃত্যং এয় সঙ্গীত মূচ্যতে" (সঙ্গীত রত্নাকর) বহুমুখী ব্রহ্মবিদ্যার অন্যতম সঙ্গীতবিদ্যা। ভাবের জগতে মুখ্যত এর দুটি প্রধান দিক। প্রথমটি ধ্রুপদীয় আত্মমুখি, দ্বিতীয়টি লোকগাথা চিত্তমুখি। পৃথিবীতে সৃষ্ট জীবলোকে শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে স্বীকৃত মানব। মানবজীবন একমাত্র সাধন উপযোগী, সূক্ষ ইন্দ্রিয়াদি ও মনবুদ্ধি দ্বারা সমৃদ্ধ। মন-চিত্ত-বুদ্ধির দ্বারা মানব পূর্ণ মানবতা প্রাপ্তির যোগ্য। বিক্ষিপ্ত মন বুদ্ধিকে শৃঙ্খলিত করে স্থির আত্মমুখি (ব্রহ্ম বা ভগবান) করার এক সাধনশৈলী সঙ্গীত। অপর দিকটি হলো মনও চিত্তবৃত্তিক আহ্লাদ উদ্রেককারী, প্রীতি উদ্রেককারী; তা সঙ্গীতের আনুসঙ্গিক লাভ। অবশ্য এ সকল বাক্য এক মাত্র সঙ্গীত প্রেমী সাধকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তা মার্গ বা গন্ধর্ব সঙ্গীত শিল্পীই হোক বা লোকরঞ্জক লোকসঙ্গীত শিল্পীই হোক। প্রথমোক্ত মার্গ সঙ্গীত আত্মপ্রধান ব্রহ্মানন্দ, আত্মানন্দ, ভূমানন্দ গোরক যাই বলা হোক না কেন তা নিত্য ও শাশ্বত। অপরটি চিত্তরঞ্জক, শ্রুতিনন্দন, স্থুল, মনোরঞ্জনের উপায় মাত্র। তা কালে, যুগে সদা পরিবর্তিত। সুর, তাল, লয়, ছন্দ সব কিছু যে যুগে যেমন, সে যুগে সে তেমনি আধুনিক। আজকের আধুনিক কালে সে পুরাতনিক হিসাবেই পরিচিত।

বিশেষ ভাবে লক্ষ করলে আমরা দেখি, তালের ক্ষেত্রে অর্থাৎ বাদ্য যন্ত্রের ক্ষেত্রে কিছু বিশেষত্ব আছে।

উল্লেখ্য, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অনবদ্য বাদ্য ব্যবহৃত হতো। যেমন — মুদঙ্গাম, পাখোয়াজ, তবলা, খোল ইত্যাদি। এই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন আছে। প্রত্যেকটির বোলবাণী, পদছন্দ স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট যা তাদের লক্ষণ। এগুলির হানি হলে বাদন শৈলীর শুদ্ধতা লঙ্ঘিত হয়। আলোচিত বিষয় শুধু রাগ বা মার্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে দৃঢ় রূপে প্রযোজ্য, একথা গুণিজন দ্বারা শাসিত ও নির্দেশিত। সঙ্গীত বা যন্ত্রবাদ্য (সেতার, সারেঙ্গী প্রমুখাদি) নৃত্য ও সঙ্গীতের বিবিধ অনবদ্য বাদ্যের প্রচলন ছিল যা বর্তমানেও আছে। এখন তবলা নামে অনবদ্য বাদ্যযন্ত্র সমন্ধে যা কিছু জানা যায় তা বহু বিতর্কিত। বিভিন্ন মহাজন দ্বারা বিভিন্ন আনুসন্ধানে বিভিন্ন তথ্য জানা যায়। কারো মতে ত্রয়োদশ শতকে আরবি দ্বারা আক্রান্ত ভারতবর্ষে আরবীয় সঙ্গীতের সঙ্গাতে ব্যবহৃত যন্ত্র বর্তমান তবলার প্রায় সদৃশ। অনেকে অনুমান করেন চতুর্দশ শতকে পখাবজের কিছু রূপান্তরিত যন্ত্র তবলা। বর্তমানে এই নাম সম্পর্কে এমন গল্প প্রচলিত আছে যে পখাবাজকে দু'টুকরো করে তাকে বাজানো হলে, দু'টুকরো করার পরও শব্দ আসায় তাঁরা বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন 'তো ভি বোলা', পরবর্তী কালে তবলা।

আরব দেশে চর্ম বাদ্য তবল থেকে তবলা শব্দ, বাদ্যকর জুবলের পুত্র টুবল দ্বারা এই যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল তাই তাঁর নাম অনুসারে তবলা। আবার অনেকের মতে, খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে সম্রাট আলাউদ্দিনের সময়ে পারস্য দেশীয় কবি আমির খসরু এই যন্ত্রটি তৈরি করেন। আবার বিষ্ণুপুর ঘরানার গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে, সদারঙ্গের শিষ্য দ্বিতীয় আমির খসরু এই যন্ত্রের উদ্ভাবক। সুধা কলস বলেছেন, তবল অর্থাৎ তবলা মেলেচ্ছ বাদ্য। চতুর্দশ শতকে মেলেচ্ছ বলতে মুসলমানদের বোঝাত। এই মতের কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু একথা অনুমান করা যায় যন্ত্রটি খেয়াল, গজলের সঙ্গে বাজানো হতো বলে ভারতীয় বিদ্বানগণ এই বাদ্যকে আলোচনার যোগ্য বলে মনে করেননি। মার্গসঙ্গীত ধ্রুপদই তাঁদের চরমতম লক্ষ ছিল। তবে 'সঙ্গীতোপনিষৎসারে' এটুকু প্রমাণ আছে যে, তবলা ঊনবিংশ শতকের আগে থেকেই এদেশে আছে। জানা যায়, দরবারে যখন গজল, খেয়াল স্থান পায় তখন থেকেই সঙ্গাতে তবলার প্রাধান্য ছিল। সাধক কবি কবিরের সময় কালে অষ্টাদশ শতকে এই তবলা সাধারণ গানেও বাজানো হতো। তবলার গঠন গত পরিমার্জন ও বিবর্তনের ফল স্বরূপ আধুনিক তবলার রূপ। সংগীতে তবলাকে সঙ্গীত সঙ্গা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। বর্তমানে তবলা সঙ্গীত সঙ্গা লাভ করেছে। আরো বিশেষ একক তবলা বাদন পূর্বে এখনকার মতো প্রচার ও প্রসার লাভ করেনি। যারা গুণী শিল্পী ছিলেন তাঁরা প্রায়শ মুখ্যত সাঁতেদার ছিলেন। একক বাদন প্রচার ও প্রসারের অভাব ছিল। এর অনেক কারণ থাকতে পারে। সত্রী সমাজে এই শিল্পকে পরিবেশন করার ছন্দবন্ধ পদ্ধতি ক্রমের অভাব, এছাড়া ছিল শ্রোতার অভাব। কারণ, সুর ছন্দের সঙ্গীত যেমন সাধারণ শ্রোতার চিত্তাকর্ষক ও বোধগম্য, বাদ্যযন্ত্রে বিশেষ করে অনবদ্ধ বাদ্য (তবলা) বোল, বানী লয়কারী শোনার শ্রোতার সংখ্যা মুষ্টিমেয়। সাধারণ শ্রোতাগণ হেলে দুলে সঙ্গীতের রস উপভোগ করেন। আবার সেই শ্রোতাগণকেই যদি তবলা লহরায় হাতে তালি দিয়ে লয় রাখতে বলা হয় তবে অধিকাংশই গলদঘর্ম হবেন। অথবা এমনও হতে পারে গুণী শিল্পীগণ হয়তো তাঁদের সাধনাতে এতই নিমগ্ন ছিলেন প্রয়োজনে শুধু সাতসঙ্গাতের মাঝেই যেটুকু বাদ্য পটুতা প্রদর্শন প্রয়োজন সেটুকুই পরিবিশেন করেছেন। একক ভাবে এই যন্ত্রকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার কথা আত্মভোলা শিল্পীগণ ভাবেননি। হয়তো এই ব্যপারে তাঁরা উদাসীন ছিলেন। বর্তমান যুগে তা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে। সাঙ্গীতিক যন্ত্রের প্রতি এই এক উদাসীনতার দিক। যে সাতসঙ্গাত বিনা সঙ্গীত অপূর্ণ, রস মাধুর্য হীন অর্থাৎ জলহীন নদী, ফলহীন বৃক্ষ, চন্দ্রহীন রজনী, গন্ধহীন। তাই পুস্পর মতো লয়, তাল, সঙ্গাতহীন সঙ্গীত কতটুকু মাধুর্য প্রদানে সক্ষম। যন্ত্রসঙ্গীতে রাগের আলাপের পরে জোড়ও পরে, বিলম্বিত ইত্যাদি ক্রম। আলাপ ও জোড়ে প্রত্যক্ষ সঙ্গাত না থাকলেও অন্তঃসলিলা একটি লয়কে আশ্রয় করে আলাপ বাদন, জোড়তা লয়কারীও নানান ছন্দে নিবন্ধ। পরে বিলম্বিতে প্রত্যক্ষ সঙ্গাতের শুরু। যে সঙ্গাতের বাদ্যযন্ত্র (তবলা) সেই লয়, তাল, ছন্দ দ্বারা সঙ্গীতের পূর্ণতা ও পুষ্টি বর্ধন কারক সেই সাতসঙ্গাতে আজও সঠিক মানের মূল্য থেকে কিছুটা হলেও বঞ্চিত। একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, ভারতীয় সঙ্গীতের পরম্পরা গত যে প্রবাহ তার সামগ্রিক একটি ছন্দোবন্ধ পরিকাঠামো তৈরি হয় আনুমানিক ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে।

ভারতবর্ষের সঙ্গীত পদ্ধতির ধারা দু-ভাগে বিভক্ত; একটি উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতি অপরটি দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্ণাটকী সঙ্গীত পদ্ধতি। অর্থাৎ পদ্ধতিগত সঙ্গীতের প্রকার আগে ছিল না, ছিল ঘরানা বা বাজ। ১৮৬০ সালে মহারাষ্ট্র মুম্বাই-এর বালকেশ্বর গ্রামে ১০অগস্ট শুভ মহাঅষ্টমী তিথিতে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখন্ডেজির জন্ম। তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন এই মানুষটি ওকালতি পাশ করেন। ছোটোবেলা থেকে মায়ের কাছে ভজন শুনে শুনে সঙ্গীতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ তীব্র হয় এবং ওকালতি ছেড়ে সঙ্গীত সাধনায় নিমগ্ন হন। প্রথমে সেতার দিয়ে তাঁর শিক্ষা শুরু হলেও কণ্ঠসঙ্গীতে তিনি আকর্ষিত হয়ে ব্রতী হন। শিক্ষাকালে তাঁর একটি অভিজ্ঞতা হয়, তিনি দেখেন বিভিন্ন উস্তাদের বিভিন্ন মত, একের সঙ্গে অন্যের মতের মিল পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি সঙ্কল্প করেন একটি সর্বমান্য মত রাগরাগিনির ক্ষেত্রে হওয়া দরকার যা সঙ্গীতকে সুসংবদ্ধ করবে। তাই গায়ক হওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করে তিনি সংস্কারের দিকটাই বেছে নেন এবং তাঁর সাধনা শুরু করেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ ভ্রমণ ও সঙ্গীতের আকর অনুসন্ধান করে তিনি তাকে ছন্দবদ্ধ করেন। বর্তমানে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতি বলে যা জানি পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখন্ডেজী তার জনক। বিজ্ঞানভিত্তিক বিচার বিশ্লেষণ করে তিনি রাগসঙ্গীতের ক্ষেত্রে এক যুগান্তর আনেন। বর্তমানে আমরা যারা উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতির গায়ন বাদন করি তা ভাতখন্ডেজীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

অপর দিকে আরেক উজ্জ্বল নক্ষত্র পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পালুস্করের জন্ম ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ১৮ অগস্ট। পিতা দিগম্বর পাল একজন পথিতযশা কীর্তনিয়া। সেই ধারা পুত্র বিষ্ণুদিগম্বরকে প্রভাবিত করে। বাল্য বয়েসে বাজি পড়ানোর সময় চোখে আঘাত পেলে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়, ফলে তাঁর লেখাপড়া অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তিনি পূর্ণরূপে সঙ্গীত চর্চায় মনোনিবেশ করেন। এক অদ্ভুত কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন বিষ্ণুদিগম্বর পালুস্কর। কথিত মন্ত্রসপ্তক থেকে পাঁচটি সপ্তক পর্যন্ত তিনি স্বর বিচরণ করতে সক্ষম ছিলেন। অতি দ্রুত তান করতেও সক্ষম ছিলেন। তাঁর কণ্ঠের যাদুতে সকল শ্রোতাগণ মোহিত হয়ে পড়তেন। দক্ষিণ ভারতে বর্তমানে তাঁর সৃষ্ট স্বরলিপি পদ্ধতি প্রচলিত যা আমরা দক্ষিণ ভারতীয় স্বরলিপি পদ্ধতি বলে জানি। তিনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি উপনিষদীয় শিক্ষা ব্যবস্থার আদর্শে সঙ্গীত শিক্ষা দান করতেন। সেই সময় তাঁর শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় একশ জন। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের সার্বিক চিন্তা-ভাবনায়ও ক্রম পরিবর্তন ঘটেছে। বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সাহিত্য, দর্শন সকল আঙ্গিকের পরিবর্তন হওয়াটা বোধহয় কালধর্ম বা যুগধর্ম। সঙ্গীতশিল্পও তার ব্যতিক্রম নয়। ধ্রুপদী সঙ্গীতের যুগে যখন এই ধ্রুপদেরই একমাত্র প্রাধ্যান্য ছিল তখন খ্যাল, গজল, ঠুমরী গায়ককে ধ্রুপদীয়রা নিজ সারিতে রাখতে কুণ্ঠা বোধ করতেন। সেই সময় সঙ্গাত ও সঙ্গীত দুই শিল্পীর মানসিকতা যেন দুই যোদ্ধা, কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ খ্যাতি-রূপ-রাজ্য জয়ের জন্য। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের সঙ্গীত ও সঙ্গাতের নানান কূট-কৌশলের প্রয়োগ কেবল মাত্র একে অপরকে পর্যুদস্ত করার জন্য। উদ্দেশ্য শ্রেষ্ঠ হিসাবে শ্রোতাদের কাছ থেকে স্বীকৃতির শিরোপা লাভ। তাতে সুমধুর সঙ্গীতের সুমধুর বা চিত্তরঞ্জন কারিও থাকত না। অনেক সময় আস্ফালনের প্রতি আস্ফালনও মুখ্য রূপ ধারণ করত। এমন অবস্থার জন্য সেই সব শিল্পীদের কোনো ভ্রুক্ষেপ বা ভাবার অবসর থাকত না। কারণ তাদের ঘরানা কৌলীন্য বা বাজ কৌলীন্যের অহঙ্কার। অবশ্য উদারপন্থী বা ব্যতিক্রমী শিল্পী যে ছিল না তা নয়। "থোড়িসি গা লি, তো কোন সা কুদরতি কি"— এমন শিল্পীও ছিলেন।

বর্তমান অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, প্রচ্ছন্ন ভাবে নিজ গরিমা অর্থাৎ পাণ্ডিত্য প্রকাশের ইচ্ছা শিল্পীর নিশ্চিত ভাবে থাকবে নচেৎ শিল্প দরিদ্র হয়ে যাবে। কিন্তু বর্তমানে সঙ্গাত ও সঙ্গীত সুষ্ঠু ও রুচিশীল সুচারুভাবে শ্রোতাদের হৃদয়ে মর্যাদা পূর্ণ পরিবেশের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। তাতে শিল্পীগণ বর্তমানে বেশ সজাগ ও একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল। কোনো ক্ষেত্রে গায়নে বা সঙ্গাতে কারো কোনো ক্ষুদ্র ভুলভ্রান্তিকে সংশোধন করে সঙ্গীত আসরে রসমাধুর্যকে সন্তপর্ণে রক্ষা করে নেওয়ার উদারতা গায়নের বা সঙ্গাতকারের অপরাধ নয়। যদিও এ আমার একান্তই ব্যক্তিগত মত। বিশেষত সঙ্গাতকারী আমাদের এতটুকু উদারভাব সঙ্গীত সভার ক্ষেত্রে রাখা দরকার, যাতে সঙ্গীত রসমাধুর্যের প্রবাহ রসাভাসে পরিবর্তন না হয়। এই উদারতা শিক্ষার ক্ষেত্রে চলে না।

কারণ শিক্ষাক্ষেত্রে সঙ্গীতের ব্যাকরণই শেষ কথা। একজন সাতসঙ্গত হওয়ার জন্য তার একটু উদারপন্থী ও ক্ষমাশীল হওয়া বোধহয় প্রয়োজন। তাতে শিল্পীর নিজ শিক্ষা মানের মর্যাদাহানি থেকে মর্যাদালাভই হয়তো বেশি হবে। কারণ অধিকারী অর্থাৎ যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি একমাত্র সহানুভূতি দেখাতে পারে। এ কম ভাগ্যের কথা নয়।

পরিশেষে বলা যায়, সঙ্গীত থেকে রস সঞ্চয় চিরকালই প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে চলেছে। কবিগুরুর ভাষায় — "দেশের প্রাচীন সরবর বুজে গিয়ে তার উপর আজ যেমন চাষ চলছে তেমনি শিক্ষিত পাড়ায় সঙ্গীত প্রায় মরে এসেছে, তার উপর এগিয়ে এসেছে পাঠ্যপুস্তকের আবাদ। "আজ বোঝবার সময় এসেছে; সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, এক কথায় সার্বিক কৃষ্টি প্রগতি মানবতার প্রতিষ্ঠা তা শুধু বিজ্ঞানের দ্বারাই সম্ভব নয়, মানুষের হৃদয়ের সেই অনির্বচনীয়কে উপলব্ধি ও আস্বাদন করেই তৃপ্ত, শান্ত সমাহিত হবে, তাতে সঙ্গীতের স্থানই অনেক অংশ জুড়ে অধিকার করে আছে। এর দ্বারাই জগতের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হবে। "তমসো মা জ্যোতির্গময়।"

গ্রন্থ পঞ্জি:

১. 'কুদরত রঙ্গিবিরঙ্গি', কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৪০২
২. 'তবলার ইতিবৃত্ত', শম্ভুনাথ ঘোষ
৩. 'প্রসঙ্গ তবলা', আলক দত্ত, প্রকাশ ১৩৯৫
৪. 'ভারতীয় তাল প্রসঙ্গ', প্রবীর কুমার ভট্টাচার্য, অন্বেষণ প্রকাশনী, কলকাতা
৫. 'সঙ্গীত চিন্তা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬. 'সঙ্গীত প্রভাকর', নিত্যপ্রিয় ঘোষ দস্তিদার, নবম পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ ২০২৩
৭. 'সঙ্গীত রত্নাকর (বাংলা অনুবাদ)', ডঃ প্রদীপ কুমার ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমি

লেখক পরিচিতি: দেবাশীষ দাস, সঙ্গীত বিভাগ (S.A.C.T.), পূর্নিদেবী চৌধুরী গালর্স কলেজ, শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ।